"প্রগতি"

তৃতীয় বর্ষ
ডিজিটাল ভার্সান

বিশেষ সংখ্যা
প্রকৃতি-পরিবেশ স্থিতিশীল উন্নয়ন
২০২২

ভূগোল বিভাগ

ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ
দক্ষিণ বারাসাত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পত্রিকা সৃজন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ ডঃ সত্যব্রত সাহু
বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা মণ্ডলী
বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রী গণ
এস. কে. প্রিন্টার্স

শুভেচ্ছা বার্তা

প্রকৃতি পরিবেশ ও স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ক ভূগোল বিভাগের বার্ষিক পত্রিকা 'প্রগতি'-র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। ভূগোল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমি ভীষণ গর্ব অনুভব করি। আমি কামনা করি তাদের এই নবতর প্রয়াস সকলের সমাদর অর্জন করবে। মৌলিক ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়ে এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা নানামুখী লেখার মাধ্যমে নিজেদের মেলে ধরেছে এই পত্রিকায়। এই সৃজনশীল চিন্তা ও বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা এই বিভাগকে এক নতুন স্তরে পৌঁছে দেবার অন্যতম প্রচেষ্টা। আমি বিশ্বাস করি তাদের পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিকূলতা অতিক্রম করে দেশ ও জাতি গঠনে সম্ভাবনাময় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সুচারুভাবে বিন্যস্ত এই পত্রিকাটির প্রতিটি লেখা আমার ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পীমনের বলিষ্ঠতার দাবি রাখে। শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ও মূল্যবান অবদান রয়েছে এই প্রকাশনায়। এই পত্রিকা প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সবশেষে যাদের লেখা এবং যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ডঃ সত্যব্রত সাহু

অধ্যক্ষ

ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ

সম্পাদকীয়

“প্রগতি” নামটা এক প্রতিকী। ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজের ভূগোল পরিবারের করোনা কাল পর্বের ডিজিটাল ম্যাগাজিন। আমাদের ভাবনায় ভূগোলের দিক-আঙ্গিক এই নিয়ে তৈরী এই ম্যাগাজিন। বিগত বছর গুলোতে জড়ো করা হয়েছিল করোনা কালের ভাবনা গুচ্ছ। আবার রবীন্দ্র লিখনের ভাবনায় আমাদের সৃষ্টি। বাস্তব সাহিত্যের অনুষ্ঠানে “প্রগতি” আমাদের পথ চলতে শেখায়। এবারের ভাবনায় সেজে উঠুক পরিবেশ এবং উন্নয়নের সম্পর্কে স্থিতিশীলতার নানা দিক। দ্রুত সব কিছু বদলে যাচ্ছে। উন্নয়নের চাকায় পৃথিবী আবর্তমান। জলবায়ুর পরিবর্তনে পৃথিবীর বসবাসযোগ্য পরিবেশ প্রশ্নের মুখে। প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্রুত এই পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে প্রাণী জগতের ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পরিবেশের পরিবর্তন। আবার পরিবেশের পরিবর্তন তৈরী করছে বসবাস যোগ্যহীন অবস্থা। সম্প্রতি রিপোর্টে জানা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের সামুদ্রিক অঞ্চলে Bramble Cay Melomys নামে ইঁদুরের প্রজাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন প্রথম কোন প্রজাতি সম্পূর্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই ইঙ্গিত পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য খুব আশাব্যাঞ্জক নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপন এর মধ্যে এই চলুক পরিবেশ চর্চা। পরিবেশ যা বর্ধিত অংশের নাম তার ব্যবহার - স্থিতিশীল উন্নয়ন নিয়ে নিরন্তর চলুক আমাদের ভাবনাচিন্তা।

এই সংরক্ষিত ম্যাগাজিনে আমাদের সকলের পরিবেশ এবং উন্নয়নের দিকগুলি সংকলিত থাকলো। এর প্রেখিতে আলোচনা চলুক উঠে আসুক আরো নতুন ভাবনা।

শুভেচ্ছা সহ — ভূগোল পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা
১।	পরিবেশ স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রবন্ধ সূচি তালিকা	কৌশিক হালদার	১ - ৩
২।	প্রকৃতি, পরিবেশ স্থিতিশীল উন্নয়ন-এর উপর একটি প্রবন্ধ	স্বরূপ হালদার	৪ - ৫
৩।	প্রকৃতি, পরিবেশ-স্থিতিশীল উন্নয়ন	তাজরিন সুলতান	৬ - ৯
৪।	পরিবেশ এবং শিক্ষা	পৌলমী দাস	১০
৫।	প্রকৃতি ও পরিবেশ স্থিতিশীল উন্নয়ন	বর্ষা নস্কর	১১ - ১২
৬।	পরিবেশ পরিবর্তন পরিকল্পনা	বুবাই নস্কর	১৩ - ১৪
৭।	প্রকৃতির বেদনা	বিভাস হালদার	১৫
৮।	রবি ঠাকুরের পরিবেশ চেতনা	সোমনাথ মিস্ত্রি	১৫
৯।	ছবি	বিশ্বজিৎ নাইয়া	১৬
১০।	পরিবেশ বিষয়ক রচনা	রাসিদা মণ্ডল	১৭
১১।	কবির ছন্দে প্রকৃতির কণ্ঠে	বিশ্বজিৎ নাইয়া	১৮
১২।	অরণ্য ও বন্যপ্রাণী বিপর্যয় ও সংরক্ষণ সুন্দরবন	সাগরিকা হালদার	১৯
১৩।	নিস্তব্ধতা	পূরবী, সুদীপ্ত, রাজিয়া	২০
১৪।	বিষম অসুখ	সৌমেন বৈদ্য	২১
১৫।	যে জলকে অবহেলায় করছো আজ অপচয় ও বিষাক্ত.....	পারুল দাস	২২ - ২৩
১৬।	প্রকৃতি পরিবেশ ও স্থিতিশীল উন্নয়ন "গড়িয়ে চলুক মাড়িয়ে নয়"	মানসী ভুঞ্যা মাল	২৪
১৭।	পরিবেশ ও ভূগোল ঃ ব্যবহারিক দিক	ব্রততী দে	২৫ - ২৬

KOUSHIK HALDER
B. A. Honours
Sem - 3

পরিবেশ স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রবন্ধ সূচি তালিকা

ভূমিকা ঃ এই পৃথিবীতে মানুষ জীবন যাপন করে মূলত দুটি মৌলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে। তার একটি হল সহায় এবং অন্যটি সম্ভাবনা। সহায় এবং সম্ভাবনা এই দুয়ের পারস্পরিক মিথক্রিয়ার উপর ভিত্তি করেই মানব সভ্যতার উন্নতি সাধিত হয়। সহায় এবং সম্ভাবনা সভ্যতার উন্নতি সাধিত হয়। সহায় এবং সম্ভাবনা সভ্যতাকে যথাক্রমে ধারন ও বহন করে নিয়ে চলে। কিন্তু জীবনধারণের এই দুইকে মৌলিক উপাদান একা পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না।

একদিকে যেমন সহায় সম্ভাবনাকে বিকশিত করে অন্যদিকে তেমনি বিকশিত সম্ভাবনা সহায়কে সংরক্ষন করে। ওতপ্রোতভাবে জড়িত পারস্পরিক এই সম্পর্কের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানব সভ্যতার উন্নতির রহস্য।

আমাদের পরিবেশ ঃ আমাদের পরিবেশ হলো আমাদের সকলের অস্তিত্বের আধার, সভ্যতার আদি এবং অনন্ত। পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই মানুষ তথা এ পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীকুল জীবন ধারন করে থাকে। মানুষ তার সভ্যতাকে যতই উন্নত করে তুলুক না কেন, এই পৃথিবীর মানুষকে তার পরিবেশের সাথে এমনই এক অলঙ্ঘ্য শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে যে সেই বন্ধন থেকে মুক্তির অর্থ মানব অস্তিত্বের বিনাশ।

পরিবেশ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ পরিবেশ উন্নয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে আমাদের পরিবেশের রূপ যদি এতই ব্যাপক এবং শাশ্বত হয় তাহলে তার উন্নয়নের প্রয়োজনে মানবজাতির অবদানের কোনো ভূমিকা আদৌ থাকতে পারে কি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য হল পরিবেশের এই উন্নয়ন বলতে প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ সংরক্ষনকে বোঝানো হয়ে থাকে। সৃষ্টির আদি লক্ষন থেকে পরিবেশে থেকে বেঁচে থাকার উপাদান আহরন করে মানুষ জীবন ধারন করতে কখন সেই আহরন নির্বিচার শোষনে পরিনত হয়েছে মানুষ তা অনুধাবন করতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে এই শোষণের ফলে আমাদের চারপাশেব পরিবেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তার নির্মল রূপ বহুগুনে বিনষ্ঠ হয়েছে। পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে নানান প্রানীকুল তথা উদ্ভিদরা।

পরিবেশ এবং শিক্ষার্থী ঃ এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত ঃ এই প্রতিবেদনের সূচনালগ্নেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে পরিবেশ যেমন আমাদের সভ্যতার প্রধান সহায় তেমনি ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষার্থীরা হল সমাজের প্রধান সম্ভাবনা। ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনন্ত সম্ভবনার ওপর নির্ভর করেই বর্তমান কালের এই উন্নত উদ্ধত সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছে। এই দানবীয় সম্ভবনাকে যদি পরিবেশের উন্নয়ন কার্যে ব্যবহার করা যায় তাহলে পরিবেশ সংরক্ষন সংক্রান্ত কর্মসূচির বাস্তবায়নের পথে সকল বাধা দূরীভূত হতে পারে।

উপমহাদেশীয় ইতিহাসে পরিবেশ বন্ধন ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বারবার পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকলে যখন শিক্ষার্থীগন ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য গুরুগৃহে দিন যাপন করত, তখন সেখানে সেই সব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি পরিবেশের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কও গড়ে উঠত। প্রাচীন ভাতরীয় গুরুকুলমূলক শিক্ষা কাঠামোর মূল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই এভাবে উঠেছিল। শিক্ষা গ্রহনের পাশাপাশি তারা পরিবেশের অন্তহীন গুরুত্বকে অনুধাবন করতে শিখত। এই শিখনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী সমাজকে ধারনামূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্যে করত।

বর্তমানকালে ছাত্র-ছাত্রী ও পরিবেশের সম্পর্ক ঃ বর্তমান যুগে দ্রুতগতির জীবনযাত্রায় প্রাচীনযুগের সেই পরিবেশমূলক শিখনের রূপ বহুমাত্রায় বদলে গিয়েছে। আধুনিক যুগে বহুকাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। এই ফলে হিসেবে বর্তমান সমাজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ যথেষ্ট মূল্যবোধের লক্ষ্য করা যায়।

পরিবেশ উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি ঃ পরিবেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে গেলে সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনার বীজ রোপন করতে হবে। প্রাথমিককালে শিক্ষার্থীদের মনের অন্তঃস্থলে এই বীজ রোপিত হলে ধীরে ধীরে তা পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যবোধের মহীরুহ হয়ে উঠবে।

তখন আপনা থেকেই তাদের মধ্যে পরিবেশের উন্নয়ন মূলক বিষয়ে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ জন্মাবে। একটু করে পরিবেশের উন্নয়নমূলক নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করানো যেতে পারে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে বাধা ঃ শারীরিক সক্ষমতা উন্নয়ন মূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করে কোন জীবানু কিংবা ব্যাধি যাতে ছোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাসা বাঁধতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয় এছাড়া তরুন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রক্ষোভহীন কর্মমূলক উদ্দীপনা অধিক থাকার তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যথাযথ পরিচালকের প্রয়োজন হয়। এই সকল প্রাথমিক সমস্যাগুলি ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রিত করে পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রেও যথাযথ উদ্যোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

গৃহীত উদ্যোগ সমূহ ঃ বিশ্বজুড়ে যথেষ্ট উদ্যোগের অভাব সত্ত্বেও পরিবেশ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনমূলক কর্মসূচি আয়োজনের বিভিন্ন ছোট বড় সাধু উদ্যোগকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যার কথা মাথায় আসে তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরু তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনের জন্য চালু করেছিলেন বনমহোৎসব।

পরিবেশের উন্নয়নকে কিভাবে একটি উৎসবের রূপ দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে এই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এখনো এই উৎসব। শান্তিনিকেতনে প্রতি বছর মহাসমারোহ পালিত হয়। তাছাড়া আধুনিক যুগে প্রথম বিশ্ব বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রম এর পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যে অংশগ্রহন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

উপসংহার ঃ যে চারাগাছটি আজ পদতলে দলিত হয়। ভবিষ্যতে সেই চারাগাছই মহীরুহ হয়ে ছায়া দান করবে জীবকুলকে। এইভাবে যে ব্যক্তি আজ ছাত্র কিংবা ছাত্রী, সেই অদর ভবিষ্যতে সমাজের সম্ভবনাময় ভবিষ্যত বিধান করবে। তাই ছাত্রছাত্রী এবং পরিবেশ এই দুইয়ের মিলিত মিথঃস্কিয়ার দ্বারাই একটি সুস্থ পৃথিবীর পট রচনা হতে পারে।

এই অনন্ত গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সমগ্র বিশ্বকে অনতিবিলম্বে সভ্যতার সম্ভবনা ও সহায়ের মধ্যে সেতু রচনায় ব্রতী হতে পারে। এই সেতুর ওপর ভর করেই ধারন মূলক উন্নয়নের পথে অগ্রগামী হবে মানব সভ্যতা।

SWARUP HALDER
B. A. Honours
Sem - 3

বিষয়

প্রকৃতি, পরিবেশ স্থিতিশীল উন্নয়ন-এর উপর একটি প্রবন্ধ

প্রবন্ধ রচনা ঃ প্রাত্যহিক জীবনে পরিবেশের ভূমিকা

ভূমিকা ঃ Nature যে আমাদের Natural করে সে কথা বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধত্তর পৃথিবীর অবস্থা দেখে তার সাহিত্য রূপায়িত করেছেন। কেননা, মানব জীবনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী।

আমরা জানি, বনে থাকে বাঘ, গাছে থাকে পাখি, জলে থাকে মাছ অর্থাৎ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বেঁচে থাকার উপরে পরিবেশের আন্তঃক্রিয়া তথা বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি বজায় থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমরা অক্সিজেন গ্রহন করি এবং পরিবেশকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফিরিয়ে দিই।

পরিবেশের খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে আমরা খাদ্যগ্রহন করে বেঁচে থাকি। পরিবেশের জলবায়ু, অরন্য আমাদের জীবনধারনের রসদ যোগায়।

বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় তার আরণ্যক ও 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন।

পরিবেশের সংজ্ঞা ঃ মানুষকে ঘিরে যাবতীয় জড় ও সজীব উপাদানগুলিকে একত্রে পরিবেশ বলা হয়। অর্থাৎ আমাদের চারপাশের সামগ্রিক ভৌত ও জৈব পরিবেশের আন্তঃক্রিয়ার সৃষ্ট অবস্থা যা আমাদের জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে, তাকে পরিবেশ বলা হয়।

পরিবেশের স্বরূপ ঃ পরিবেশকে আমরা সাধারনত দুটো রূপে দেখতে পাই। যেমন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কৃত্রিম পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ আলো, বাতাস, জল, মাটি, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ -নদী, হ্রদ, জলাশয়, ঝরণা, বনভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি, মেরু অঞ্চল, তৃণলতা, গুল্ম, বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, আনুবীক্ষনিক জীবসহ জাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রানী নিয়ে গঠিত।

অন্য দিকে কৃত্রিম পরিবেশ হল মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশ। এর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদি। এই সমস্ত পরিবেশের প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ মানুষের জীবন ধারনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মানুষ জল, অক্সিজেন, খাদ্যই গ্রহন করে না। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে।

ঋতু পরিবর্তন, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এই পরিবেশের প্রভাবজাত। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তগর্ত জলজ পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। স্থলজ পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমতলের পরিবেশ, মরু অঞ্চলের পরিবেশ, মেরু অঞ্চলের পরিবেশ।

পারিবারিক পরিবেশ ঃ কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পারিবারিক পরিবেশ বা বাড়ির পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর সবচেয়ে বেশি। জন্মের পর থেকেই শিশুরা মা ও বাবার যত্নে পালিত হয় এবং তাদেরকেই ভালোভাবে চিনতে বা জানতে শেখে।

বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাড়ির কাছের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়। বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে গৃহস্থালির কাজ, ন্যায়-নীতি বোধও জাগ্রত হয়। গুরুজনদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশুদের চরিত্র, আচার-আচরন প্রভৃতি গুণাবলীর উন্মেষ শিশুমনে ঘটতে থাকে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঃ পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিশু যেমন আহরণ করে, তেমনি বড় হয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও শিশুরা তাদের চারিত্রিক গুণাবলী আয়ত্ত করে। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুকে সাহায্য করে।

এই পরিবেশ থেকেই শিক্ষার্থীদের সততা, শ্রদ্ধাভক্তি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি চারিত্রিক গুনাবলীর উন্মেষ ঘটে।

সামাজিক পরিবেশ ঃ একজন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সমাজে নানা বিষয়ে বা কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন সে সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতির শিক্ষা হয় সামাজিক পরিবেশ থেকে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঃ এর পরে আসে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবের দিক — যে পরিবেশ থেকে একজন মানুষ সভ্য নাগরিক হয়ে ওঠার প্রেরণা লাভ করে। বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও সমাজে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দেশ ও জাতি সম্পর্কে একটা চেতনা জাগে।

পরিবেশ দূষণ ঃ মানুষ পরিবেশ থেকে যেমন নিয়েছে তেমনি পরিবেশকে দূষিতও করেছে। সেই দূষনের প্রভাব আজ সর্বত্র। জল, বায়ু, আকাশ, শব্দ, মাটি সবই আজ দূষনের করাল গ্রাসে পতিত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্রমাগত লুন্ঠনের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক পবিবেশও আজ দূষিত।

মূল্যবোধের অবক্ষয়, নীতিহীনতা, সুবিধাবাদ ও স্বার্থপরতার ছড়াছড়ি মানুষের সামাজিক সম্পর্কে এনেছে ভাঙন দশা। যন্ত্রের প্রভাবে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্র-সর্বস্ব, কৃত্রিম ও আন্তরিকতাবীহিন। ফলে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ আজ লুণ্ঠিত।

উপসংহার ঃ যে পৃথিবী আজ মানুষের বসবাসের আবাসস্থল, সেই পৃথিবী আজ নানাভাবে দূষিত। অথচ এই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে মানুষ পেয়েছিল প্রাণ ধারনের রসদ, অস্তিত্ব রক্ষার উপকরন। কিন্তু নিতে নিতে মানুষ আজ ভুলে গেছে তার চারপাশের পরিবেশকে।

ফলে পরিবেশের দূষনের প্রভাবেও মানুষ আজ অতিষ্ঠ। তাই মানুষকে সচেতন হতে হবে এই পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার। তা হলে অস্তিত্ব যে বিপন্ন হবে। পরবর্তী প্রজন্মের দুধে-ভাতে থাকার স্বপ্নও বিলীন হয়ে যাবে।

TAJRIN SULTANA

B. A. Honours

Sem - 3

প্রকৃতি, পরিবেশ-স্থিতিশীল উন্নয়ন ঃ

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে (৬-১৬ জুন) স্টকহোম সম্মেলনে (Stockholm Conference) ১১৪ টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি ও বৈজ্ঞানিকেরা মিলিত হয়ে সুস্থায়ী উন্নয়ন সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি ধারনা দেন। তাদের মতে প্রকৃতির সম্পদ সীমিত তাই যথেচ্ছ ভাবে এই সম্পদকে ব্যবহার করলে তিনটি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেবে —

১. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।

২. মানব সৃষ্ট (Anthropogenic) দূষনের ফলে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগৎ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে।

৩. প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হলে পরবর্তী প্রজন্ম চরম সংকটের সুম্মুখীন হবে।

কয়লা উত্তোলন　　প্রেটোলিয়াম নিষ্কাশন　　জ্বালানি গ্যাস

বিভিন্ন প্রকার খনিজ জীবাশ্ম

৪. খাদ্য ও অর্থের লোভে আমরা নির্বিচারে বন্যপ্রানী হত্যা করি। এই কারনে এদের জন্মের প্রজনন হার থেকে মৃত্যুর হার বেশি যাওয়ায় অনেক প্রানীরই অবলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায়।

বন্যপ্রাণী শিকার　　অরণ্য ধ্বংস　　মৃত বণ্য পশুর দেহাংশ

জীব বৈচিত্রের হ্রাসের কারন

৫. ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি খনিজ ধাতুগুলির আহরন প্রক্রিয়া পরিবেশকে দূষিত করে।

৬. বসতি নির্মান, শিল্পায়ন ও সড়কপথ তৈরির জন্য নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।

বসতি নির্মান

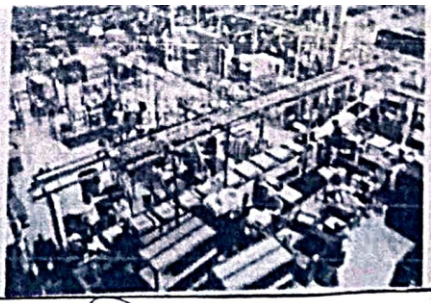

শিলল্পায়ন

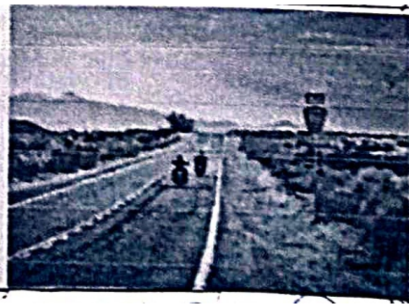

সড়ক পথ বিস্তার

সুস্থায়ী উন্নয়নের রূপরেখা

(ক) পদ্ধতি (Reduce, Refuse, Reuse and Recycle) ঃ বিভিন্ন উৎসের (বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রভৃতি ব্যবহার যথা সম্ভব কম করতে হবে। বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থগুলিকে যেমন, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক পদার্থ প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করে তা ব্যবহার করতে হবে।

(অ) রিডিয়ুস (Reduce) বা কমিয়ে আনা ঃ যে সব বর্জ্য বস্তু পুর্নব্যবহারযোগ্য নয় এবং জীব-অবিশ্লেষ্য নয় তাদের ব্যবহার কম করতে হয়। যেমন - পলিথিন, প্লাসটিক ইত্যাদি।
(আ) রিফিউস (Refuse) অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা ঃ এমন কিছু বর্জ্য আছে যার ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। যেমন - প্লাস্টিক ব্যাগ।

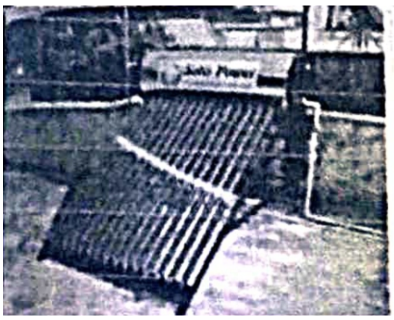

সোলার ওয়াটার হিটার

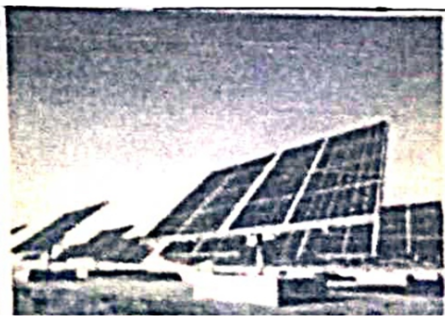

সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট

সোলার ড্রায়ার

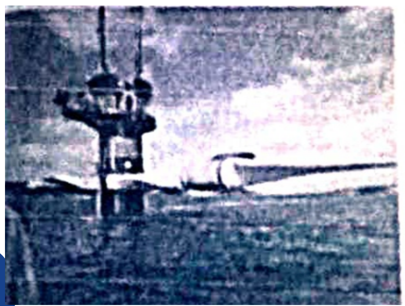

জোয়ারভাঁটার জলস্রোত

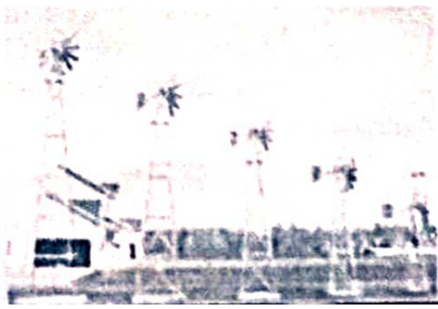

বায়ুকল

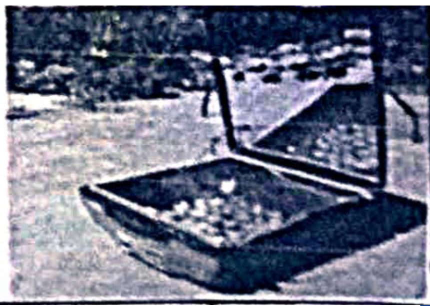

সোলার কুকার

বিভিন্ন প্রকার শক্তির ব্যবহার

(খ) অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার (Uses of Non-conventional Energy) ঃ সাধারনভাবে আমরা শক্তির উৎস হিসেবে যে উপাদানগুলি ব্যবহার করি তা নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারনে প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করে। হয় না বলে এদের অপ্রচলিত শক্তি বলে। যেমন -

(অ) সৌরশক্তিকে প্রয়োগ করে সোলার কুকার, সোলার ওয়াটার হিটার, সোলার চুল্লি প্রভৃতি।

(আ) বায়ুশক্তিকে হাওয়া কলের (Wind Mill) মাধ্যমে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। অপ্রচলিত শক্তির উৎস যেহেতু অসীম তাই এই ধরনের শক্তিকে ব্যবহার করলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনবীকরন যোগ্য শক্তির উৎস সংরক্ষিত থাকবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সুস্থায়ী উন্নয়নের আবশ্যিকতা ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রাজ্ঞ মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে পরিবেশের সুস্থিতির উপর একটি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

নিম্নলিখিত পরিবেশজনিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন যাত্রার গুনমান উন্নত হবে —

(১) জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা ঃ পৃথিবীর ধারনক্ষমতা অনুসারে বিশ্বের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। লক্ষ করা গেছে যে দরিদ্র দেশগুলিতে অশিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য পরিবার পকিল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়নি।

(২) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন ঃ জীববৈচিত্র্য দেশ তথা বিশ্বের সম্পদ।

(৩) রোগ নিবারনের পরিকল্পনা ঃ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলির (সরকারি ও বেসরকারি) ভূমিকা ঃ

সরকারি ভূমিকা ঃ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে বাসযোগ্য পরিবেশ রক্ষা করার জন্য এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকে লক্ষ করে নিয়মনীতি নির্ধারন করতে হবে।

সুস্থায়ী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সুসংস্থার নাম ঃ

(i) IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
(ii) UNEP (United Nations Environment Programme)
(iii) GPI (Green Peace International)
(iv) WWF (World Wildlife Fund)
(v) MAB (Man and Biosphere Programme)

সুস্থায়ী উন্নয়নের নীতি ঃ সুস্থায়ী উন্নয়নের নীতিগুলি আলোচনা করা হল —

(ক) পরিবেশের নীতি সমূহ ঃ (অ) জীবনের পক্ষে সহায়ক পদ্ধতি সংরক্ষন
(আ) বাস্তুতন্ত্রের সমন্বয় রক্ষা
(ই) এই পদ্ধতিগুলির সঠিক রূপায়ন।

(খ) সমাজ-রাজনৈতিক নীতিসমূহ ঃ (অ) মানুষের কাজ কর্মের মাত্রা অবশ্যই জীবমণ্ডলের মোট ধারন ক্ষমতার নীচে থাকতে হবে।

(আ) পরিবেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন করে পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহন করতে হবে।

জীবাশ্ম জ্বালানির সুস্থায়ী ব্যবহার (Sustainable use of Fossil Fuel) ঃ জীবাশ্ম জ্বালানি হল একপ্রকার বিশেষ জ্বালানি যা অবায়ুবীয় বা অবাত পচন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

জীবাশ্ম জ্বালানির সুস্থায়ী ব্যবহার ঃ জীবাশ্ম জ্বালানির সুস্থায়ী ব্যবহারগুলি হল —

(ক) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উপাদান কয়লা। কয়লা পুড়িয়ে সরাসরি তাপ পাওয়া যায়।

(খ) প্রাকৃতিক গ্যাস একসময় একটি অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত হত, যা পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে উৎপাদিত হত।

সুস্থায়ী উন্নয়নের বাধা (Obstacles of Sustainable Development) ঃ সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রধান বাধাগুলো হল —

(ক) সামাজিক বাধা ঃ দারিদ্রতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রধান বাধা।

(খ) ভোগবাদী মানসিকতা ঃ ভোগবাদী মানসিকতার জন্য মানুষ যে শুধু খনিজ সম্পদ দ্রুত আহরন করছে তাই নয়।

(গ) রাজনৈতিক বাধা ঃ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ভ্রান্তনীতি ও ভ্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহন সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

পরিবেশ এবং শিক্ষা

পৌলমী দাস
চতুর্থ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

পরিবেশের স্থিতাবস্থা রক্ষায় শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষার হাত ধরে আসে সচেতনতা। এর দ্বারা তৈরী হয় সুস্থ পরিবেশ। জীবনে চলার পথে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিক্ষা অন্যটি দীক্ষা। দীক্ষা পরিবারের তরফে আসে, আর শিক্ষা আসে শিক্ষকের তরফে। তবে সঠিক পরিবেশে বহু সময় ছাত্রছাত্রীরা দীক্ষা পেয়ে যায় শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে। জীবনে চলার ক্ষেত্রে এই দীক্ষা এবং উপযুক্ত পরিবেশ আমাদের সহায়ক হয়ে ওঠে।

ডঃ আব্দুল কালাম বলতেন, 'আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীতে শিক্ষকের চেয়ে সমাজের জন্য মঙ্গল আর কোনও পেশা নেই। একই সাথে স্মরণ করতে পারি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান কে — শিক্ষা সর্বোপরি শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠনের বিষয়ে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

এবার আসা যাক পরিবেশ এবং উষ্ণায়নের সাপেক্ষে শিক্ষা এবং দীক্ষার ভূমিকার দিকে। জাতির শক্তি বৃদ্ধি করতে, বিশ্বকে আরো বলিষ্ঠ করতে শিক্ষা এবং সুস্থ পরিবেশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই পরিবেশ কে সুস্থ রাখার দায়িত্ব উভয়পক্ষের। তাই পরিবেশ সুস্থ রাখার অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষা এবং দীক্ষার উন্নয়ন করা। এই কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সকল পথের মানুষকে এক হাতে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জীবনে চলার পথে পরিবেশ উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক শিক্ষার উন্নয়ন।

প্রকৃতি ও পরিবেশ স্থিতিশীল উন্নয়ন

বর্ষা নস্কর

চতুর্থ সেমিস্টার

সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্প-বিজ্ঞানের এই যুগেও মানুষের বিলাস বিভীষিকা রূপ পায় প্রকৃতির নিবিরতায়। জীবন জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা নগণ্য। ফলস্বরূপ বাস্তুতন্ত্রের এক ব্যাপক অংশের বিনাশ সংঘটিত হয়েছে মাত্র কয়েক বছরে।

এরপর ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে শিহরিত হতে হয়। তখন হয়তো অক্সিজেন মার্ক্স ছাড়া মানুষ বাইরে বার হতে পারবে না। বিজ্ঞানীদের অনুমান হয়তো সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে যাবে; ২০৩০ সালের পর প্রতি বাড়িতে এক একজন ক্যানসার আক্রান্ত হবে।

এই সংকট থেকে ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষিত সমাজদ্ধেক "বাঁচো এবং বাঁচাও" মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। সচেতনতার অভিযান চালিয়ে নয় হাতে কলমে প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। তা না হলে বর্তমান সমাজ সভ্যতার অত্যাধুনিকতায় অন্ধকারে ডুবে যাবে ভবিষ্যতের আলো।

নীচের ফটোকপিতে পরিবেশ দূষণের কিছু ছবি তুলে ধরলাম।

'ওজোন হোল এবং মানব সমাজ'

উন্নয়ন, চরিদিকে উন্নয়নের বিকশ ধারা। মানুষ চায় সুন্দর বিলাসবহুল অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা। কিন্তু কখন যে উন্নয়নের ছোঁয়া পেতে গিয়ে ভুলে গেছে পরিবেশের কথা তার ঠিকানা নেই ! বিবর্তনের পথে মানবসভ্যতার গতিশীলতার রথ চারিপাশের পরিবেশকে করে তুলেছে ক্ষতিগ্রস্ত তথা বিপন্ন। তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পৃথিবীর রক্ষাকবচ 'ওজন স্তর'।

বিজ্ঞানী Christian Fredrick Schonbian ১৮৪০ সালে সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ওজোন (02+0=03) হল একপ্রকার হালকা নীলাভ আঁসটে গন্ধযুক্ত একটি গ্যাস। ১৯১৩ সালে ফ্রান্সের দুই বিজ্ঞানী চার্লস ফেব্রি এবং হেনরি বুশন সর্বপ্রথম পৃথিবীকে ঘিরে থাকা ওজোন স্তরের কথা প্রমাণ করেছেন। সাধারণত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে প্রায় ২০ থেকে ৪০ কিমি উচ্চতায় এই স্তরের উপস্থিতি, যা সূর্য থেকে আগত অতি ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মির (৯৭-৯৯%) শোষণ করে উদ্ভিদ কুল ও প্রাণীকুলের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে, তাই এই স্তরকে 'পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌরপর্দা' নামে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কাজকর্মে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ওজোন স্তর ! প্রযুক্তি ও শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অসচেতন কর্মকাণ্ডের ফলে ওজোন স্তর আজ হুমকির মুখে। অধিক হারে গাছপালা নিধন, কালো ধোঁয়ার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ নানা কারণে পৃথিবীতে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে শুরু করেছে। আর অধিকহারে বাড়ছে ক্ষতিকর গ্যাস ক্লরোফ্লুরোকার্বন বা CFC । ক্ষতিকারক এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণের কারণে ওজন স্তর ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তবে কিছু প্রাকৃতিক ঘটনাকেও দায়ী করা হয় ওজোন স্তর হ্রাসে। বিজ্ঞানী মহলের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৯৭০ এর দশকের পর থেকে প্রতি দশকে ওজোন স্তর ৪% হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। যেখানে ক্রান্তীয় মণ্ডলের উপর ওজোন স্তরের ঘনত্ব ৩৫০ ডবসন। যদি এভাবে ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

দক্ষিণ মেরু প্রদেশীয় অঞ্চলে ওজোন স্তরের ক্ষয়ের পরিমাণ সর্বাধিক। ১৯৮৫ সালে মে মাসে আন্টার্কটিকা অঞ্চলে একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ওজোন হোলের সন্ধান পান। সাধারণত আন্টার্কটিকায় শীতকালে সূর্যের অনুপস্থিতির জন্য নিম্ন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে উষ্ণতা কমে গিয়ে বায়ুর তাপ দ্রুত হ্রাস পায়। বায়ুর এই দ্রুত তাপহ্রাস ও পৃথিবীর দ্রুত ঘূর্ণনের জন্য আন্টার্কটিকায় কেন্দ্রাবর্ত (Vortex) সৃষ্টি হয়। এই ভর্টেক্স মধ্যস্থ বায়ুর গতিবেগ গতিবেগ ঘন্টায় ৩০০ কিমির বেশি হয়। ফলে এই ভর্টেক্স মধ্যস্থ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও ক্লোরিন নাইট্রেটের সংঘাতে আনবিক ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়, যা পরবর্তীকালে বসন্তের শুরুতে অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন পরমানু সৃষ্টি করে। এই ক্লোরিন পরমানু ওই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ ওজোন অনুকে ক্রমশ ভেঙ্গে দিতে থাকে। যার ফলস্বরূপ আন্টার্কটিকার ওজোনস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্রমশ ভেঙ্গে পাতলা হয়ে পড়ছে। এবং স্থানে স্থানে তা প্রায় পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। যেখান দিয়ে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ছে।

তবে বর্তমানে গবেষনায় দেখা গেছে, 'মন্ট্রিল প্রটোকলের' ফলে গত দুই দশকে উত্তর ও দক্ষিন মেরুতে সৃষ্ট ওজোন হোলের আকৃতি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু ২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির যে ধারণা করা হয়েছিল তার থেকে তাপমাত্রা অন্তত ১$^{\circ}$ ডিগ্রি সেলসিয়াস শীতল হওয়ার আশা জাগিয়েছে।

আসলে ওজোন স্তরের উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। বিশেষ এই স্তর যদি না থাকতো তবে পৃথিবীর সব কিছুই মাত্রাঅতিরিক্ত তাপে বহু আগেই নষ্ট হয়ে যেত। মানুষসহ সব ধরণের প্রাণীকূলের বসবাস হয়ে পড়ত অসম্ভব। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে ধ্বংসমুখী ওজোন স্তরের প্রতি সচেতন হওয়া এবং ওজোন হোল বৃদ্ধিকারী গ্যাসসমূহ ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে আনা, যাতে পরবর্তী প্রজন্মে কে একটি সুন্দর সুস্থির পৃথিবী উপহার দেওয়া যায়।

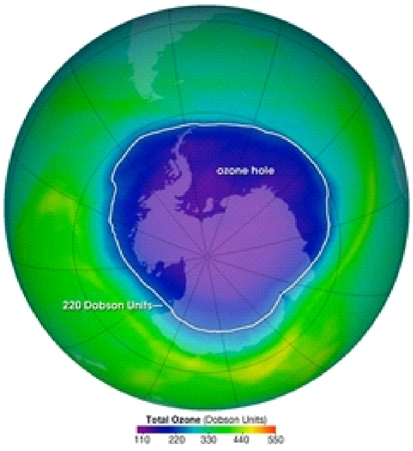

‘পরিবেশ পরিবর্তন পরিকল্পনা’

বুবাই নস্কর
চতুর্থ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

তখন আদিম যুগ। সবুজ চাদরে মোড়া পৃথিবী ছিল শান্ত, সুস্থ্য ও নির্মল। খুব অল্প সংখ্যক বনবাসী মানুষ ছিল তখন। বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, গাছের ফল মূল পেড়ে খেতে। তখন থেকেই মানুষের সঙ্গে গাছের সম্পর্কও খুবই নীবিড় ছিল। তাইতো রবিঠাকুর বলেছিলেন — “ঐ গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় এক তাল ছন্দের নাচন”।

ধীরে ধীরে বণ্য মানুষের জীবন ধারাতে এল কিছু পরিবর্তন। শিখল আগুনের ব্যবহার, লোহার ব্যবহার, আরও কত কিছু। প্রকৃতির বশে না থেকে, প্রকৃতিকে বশে আনতে চাইল মানুষ। বন্য থেকে আস্তে আস্তে মানুষ সভ্য হল। গড়ে উঠল সভ্যতা, আয়ত্ব করল পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি ছিনিয়ে নেওয়ার কৌশল। ফাঁপা হতে থাকলো পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। জনসংখ্যা বাড়ল, নগরায়ন হল, শিল্পকারখানা গড়ে উঠল। বাতাসে মিশল বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, শিল্প কলকারখানার বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) প্রভৃতি গ্রীনহাউস গ্যাস।

“জনসংখ্যা বাড়ছে, সঙ্গে
নগর, শিল্প কারখানা,
এমন যদি চলতে থাকে,
আর বেশি দিন থাকবো না,
পৃথিবীকে বাঁচাতে, চাই
সবুজ গাছ আর বনভূমি,
বৃক্ষরোপণ করবে যখন,
জানবে তবেই বাঁচবে তুমি”।

আমরা বুদ্ধিজীবী জীব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলে নিজেদেরকে দাবি করি। বর্তমান যুগে ভোগবাদটি চিন্তাধারার দিকেই মানুষ আরও বেশি করে হেলে পড়েছে। চলছে সুখে থাকার প্রতিযোগিতা। প্রতি পদে পদে আরও উন্নত জীবন যাপনের প্রতিযোগিতার লড়াই। যার পুরস্কার হিসেবে আমরা পাচ্ছি, বায়ু দূষণ, জল দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, ওজোন স্তরের অবক্ষয়, বরফের গলন, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতির মতো অযাচিত বিপদ। যার ফলে বর্তমান মান সভ্যতা চরম দুর্দশার মুখে। তাইতো প্রকৃতি প্রেমি কবি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন —

“মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও
এসে দাঁড়াও, ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও”।

এই পৃথিবীতে বর্তমান প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে সমাজবৃদ্ধ জীব হিসেবে, আমাদের কিছু করার রয়েছে। যেমন - (১) বৃক্ষ রোপন, (২) অচিরাচিত শক্তির ব্যবহার (৩) পানীয় জলে সার রোধ (৪) পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ (৫) কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ (৬) ফ্রিজ, এসি প্রভৃতির ব্যবহার কম করতে হবে (৭) বিভিন্ন পরিবেশ প্রেমী সংস্থাগুলির উদ্দোগ আরও বাড়াতে হবে।

আমাদের পরম বন্ধু, প্রকৃত বন্ধু হল গাছ। গাছ থেকে আমরা বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাই আর আমাদের দেওয়া বিষাক্ত কার্বন-ডাই- অক্সাইড শোষণ করে পৃথিবীকে নির্মল করে রাখে। তবুও আমরা নির্বিচারে সেই গাছকে ধ্বংস করতে উদ্যত হই। 'একটি গাছ একটি প্রান' এই শ্লোগানটি মাথায় রেখে এবং জন সচেতনতা বৃদ্ধি করে, নতুন প্রজন্মের জন্য, এক নতুন পৃথিবী, সুস্থ্য, স্বাস্থ্যকর, মনোরম আরামদায়ক পরিবেশ উপহার দিতে আমরাই পারব। তার জন্য বৃক্ষরোপণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

'প্রকৃতির বেদনা'

বিভাস হালদার
চতুর্থ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

প্রকৃতি আজ কাঁদছে তোমার অত্যাচারে
মরবে তুমিও করেছো দূষন যে হারে
গাছ কেটে আজ করছো তুমি বিলাসিতা
একদিন এই গাছ জ্বালাবে তোমার চিতা
জাগ্রত হোক মানব চেতনা
বুঝতে শিখো প্রকৃতির এই বেদনা।।

'রবি ঠাকুরের পরিবেশ চেতনা'

সোমনাথ মিস্ত্রি
চতুর্থ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

..... যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভালো।

..... মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে পরিবেশ সম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ...... বিধাতা প্রাণস্পন্দনের অস্তিত্বযুক্ত এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। আর এই পরিবেশকে মানুষই তার ইচ্ছা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ক্রমশ ধ্বংস করে ফেলছে। বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভুমিকা উর্বরতা দেয়, তাকেই মানুষ নির্মূল করছে। যার ফলস্বরূপ বর্তমান সমাজে মহামারীর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। আর এই মহামারীর হাত থেকে সদ্যোজাত শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। এখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষ বিধাতার সৃষ্টির ঊর্ধ্বে গিয়ে তার নিজের লোভ বা কামনাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। বস্তুত জীবনযাত্রায় জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব এখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা ......।

রবীন্দ্রনাথ দুই বিঘা জমি কবিতায় প্রকৃতির অপরূপ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,
.... নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি ....।

বিশ্বজিৎ নাইয়া
চতুর্থ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

নীল আকাশে কে ভাসাল সাদা মেঘের ভেলা

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।

Sathi Kayal

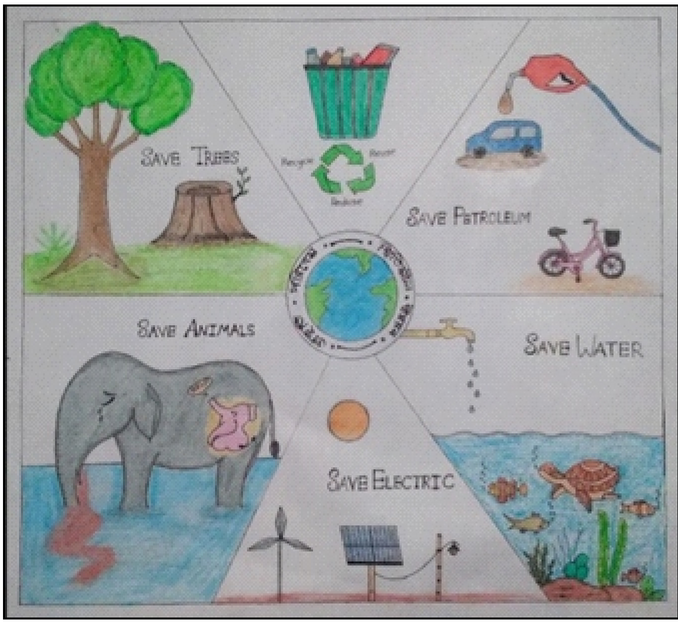

Nafisa Kayal

‘পরিবেশ বিষয়ক রচনা’

রাসিদা মণ্ডল
ষষ্ঠ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

১৮৪৫, মাওয়ার (যোধপুর)..... উষ্ণ উষর মরুভূমির মধ্যে, গুরু মহারাজ জামবাজি দ্বারা স্থাপিত ছোটো একটুকরো জনজীবন এর বাস। প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে চলেছিল তাদের জীবন। নিজেদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত গাছ কাটার ফলে প্রখর খরার কবলে পড়ে তারা, শেষ পর্যন্ত খরা অব্যাহত থাকার চরম মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়। সেই থেকে জীবন যাপনের জন্য সবুজ গাছের গুরুত্ব স্বীকার করে চিরতরে গাছ না কাটা, প্রানী না হত্যার মতো ২৯টি নীতি কঠোরভাবে পালন করতে শুরু করে। তাদের দ্বারা মরু প্রান্তরে বাবলা গাছ রোপণ এর মাধ্যমে ওই ২৯টি নীতির স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৩০, মাওয়ার (যোধপুর) ...... সেই সময়ের যোধপুরের মহারাজ অভয় সিং এর সাধ মতো প্রাসাদ নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় হল অনেক খেজরালি (বাবলা) গাছের, মহারাজের আদেশ মতো খেজরলি গ্রামের নিকটবর্তী বনানী থেকে কাঠ আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। শুরু হয় গাছ কাটা! গ্রামবাসীরা ভীতো হয়ে গাছ কাটা বন্ধ করতে জড়িয়ে ধরলো প্রতিটা গাছ তাদের মুখে একটাই কথা, “কাটা গাছের চেয়ে কাটা মাথা সস্তা”। সৈন্যরা তাদের শিরচ্ছেদ করে! ৩৬৩ জনের প্রান ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে এই হত্যাকাণ্ড রাজার আদেশে বন্ধ হয়।

২০২১, আধুনিক পৃথিবী .... আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগের মানুষ প্রতিকৃতি, পরিবেশের যে গুরুত্ব মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল আজ ৩০০ বছর পর তথাকথিত আধুনিক মানুষের মধ্যে সেই গুরুত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে! আধুনিক মানুষ পরিবেশ থেকে রশদ নিয়ে সুস্থ হবে কিন্তু পরিবেশ কে সুস্থ থাকতে দেবে না। বর্তমান সময়ের দিকে তাকালেই পরিস্কার বোঝা যাবে প্রকৃতি কতটা অত্যাচারিত। বিগত কয়েক বছরের অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী থেকে পরিস্কার বোঝা যায় পরিবেশের ধৈর্য্য সীমা অতিক্রান্ত! আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তা আমাদেরই কৃত। যার প্রতিবাদে প্রকৃতি বলছ It's time to environmental revenge !. প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব কে যদি আমরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে পালন করি তাহলে প্রকৃতি আবার আগের মত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হবে, পৃথিবীতে প্রান এর অস্তিত্ব বজায় থাকবে।

১৯৭০ সালের ৩৬৩ জন বিষ্ণই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের পরিবেশ রক্ষার জন্য আত্ম বলিদানের ঘটনা খেজরালি হত্যাকাণ্ড বা বিষ্ণই আন্দোলন নামে পরিচিত।

ভারতের ইতিহাসে এটাই প্রথম প্রকৃত পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন যার নেতৃত্বে ছিলেন অমৃতা বাই। এই আন্দোলনগুলি থেকে বোঝা উচিত “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”।

কবির ছন্দে প্রকৃতির কণ্ঠে

বিশ্বজিৎ নাইয়া
চতুর্থ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

আমি সেই প্রকৃতি!
যার হাতে সময়ের প্রগতি!!
মনে মনে সাজিয়ে রাখি........
আমার নানান রূপ!
চিত্র লেখার আলপনা দিয়ে......
ভরা পৃথিবীর স্বরূপ!!
আমি হলাম বাচ্চাদের মতো......
বেজায় বড়ো দুষ্ট!
তাইতো আমি লুকিয়ে রাখি......
মানুষের দেওয়া কষ্ট!!
করোনার থাবায় বিশ্ব সকল......
হয়েছে গৃহবন্দী আজ!
তাইতো আমার বড়োই আনন্দ.....
পেয়ে হারানো তাজ!!
মানুষ ভাবে বড়োই জ্ঞানী.....
করেছে অহংকার!
তাইতো আমার ছোট্টো থাবায়.....
পরছে হাহাকার!!
মানুষ করে তর্ক,
প্রকৃতি করে কাজ!
এই নিয়ে গঠিত.....
আমাদের সমাজ!!

অরণ্য ও বন্যপ্রাণী বিপর্যয় ও সংরক্ষণ সুন্দরবন

সাগরিকা হালদার
চতুর্থ সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত বনগুলোর মধ্যে আমাদের সুন্দরবন অন্যতম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি এ বন। এর চারদিক নিবিড় ঘন, চিরসবুজ এবং নিস্তব্ধ। সর্বত্রই সবুজের রাজত্ব। গাছপালা অপরূপ সাজে সজ্জিত। এশিয়া মহাদেশে সুন্দরবনের মতো এতো বড় অরণ্যসঙ্কুল বন আর নেই বললেই চলে। ইহা বঙ্গোপসাগর এর উপকূলবর্তী অঞ্চল, যেটি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে মিলিতভাবে অবস্থিত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভে বন হিসাবে সুন্দরবন বিখ্যাত, ১০০০০ বর্গকিমি জুরে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬০১৭ বর্গকিমি রয়েছে বাংলাদেশে আর বাকি টুকু ভারতের মধ্যে। বিশ্বের প্রতিটি নিদর্শনের নামকরণে কোনো না কোনো কারণ থাকে। সুন্দরবনেরও তেমনই রয়েছে। এখানে মূলত প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী গাছ জন্মায় বলেই এ বনকে সুন্দরবন বলা হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ বন। যার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা করে। বিশ্ব ঐতিহ্যের ক্রমানুসারে সুন্দরবনের অবস্থান ৫২২তম। এ বিরল সম্মান বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ও ভারতকে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা। সুন্দরবনকে বলা হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাণী। কেননা এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু সবুজের সমারোহ। যা দেখলে শুধু-অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে মন চায়। নিবিড় ঘন, চির সবুজ এবং নিস্তব্ধ এই সুন্দরবনে সর্বত্র সবুজের রাজত্ব। সুন্দরবন প্রতিনিয়ত সৌন্দর্য পিপাসু হৃদয়কে আকর্ষন করে প্রবলভাবে। সুন্দরবনের বাঘের গর্জন, পাখিদের কিচির-মিচির, বনের ফাঁকে ফাঁকে এক ফালি রোদের উঁকিঝুঁকি, বৃক্ষ লতাদের বাতাসে দোল খাওয়া, নদীতে মৎসকুলের খেলা এসব কিছুই যেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রকাশ। এছাড়া হিরণ পয়েন্টসহ ছোট ছোট চর বা দ্বীপ সুন্দরবনকে করে তুলেছেছ আরও আকর্ষণীয়। তাই তো প্রতিনিয়ত বিশ্বের নানা দেশ থেকে পর্যটকেরা ছুটে আসে এই বনে। পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে মূল অর্থনীতি বহন করে এছাড়া বনের প্রত্যেকটি উপাদানই অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এখানে বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হলো শাল-শেগুন কাঠ। এছাড়া সুন্দরী, গেওয়া গাছের কাঠেরও সুনাম রয়েছে দেশে-বিদেশে। এছাড়া সুন্দরবনের মৎস্যকুল আয়ের একটা বড় উৎস, যেখান থেকে কোনো প্রকার বিনিয়োগ ছাড়াই প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। এখানকার মানুষ প্রচুর মধু ও মোম সংগ্রহ করে, যা দেশের মধু চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। আইইউসিএন রেড লিস্ট অফ ইউকোসিস্টেম ফ্রেমওয়ার্ক এর অধীনে ২০২০ সালের মূল্যায়নে ভারতীয় সুন্দরবনকে বিপন্ন বলে মনে করা হয়। সমুদ্র জলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উষ্ণতা বৃদ্ধিতে লবণাক্ত সুন্দরী গাছকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আইলা, আম্ফান ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনকে অনেক বিপর্যয় করেছে গত ১০০ বছর ধরে কমপক্ষে ২৯ প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন - বাঘরোল, চিতবিড়াল ইত্যাদি। এছাড়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরী গাছ ইত্যাদি প্রায় বিলুপ্তির পথে চোরাশিকারি নিজেদের স্বার্থে বন্যপ্রাণী শিকার করে ও গাছ কেটে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করছে। এজন্য সরকার সুন্দরবনের সংরক্ষণের জন্য ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প, কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প গড়ে তুলেছে ২৫৮৫ বর্গকিমি স্থান জুড়ে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করেছে এছাড়া পাচারকারী ও শিকারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগসহ পর্যটকদের সচেতন করছে যাতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ নষ্ট না হয়। সরকারের সাথে সাথে আমাদেরকেও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

কবির ভাষায় ....

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ";

নিস্তব্ধতা

রাতের আঁধার কেটে হয়েছে প্রভাত বেলার শুভারম্ভ। হয়েছে বেশ কিছুদিন প্রকৃতির এমন নিস্তব্ধতার রঙ্গ- নিয়েছে মানিয়ে মানব প্রাণ। আর যায় না পাখিদের কোলাহল; শুধুই নিস্তব্ধতা আর নিস্তব্ধতা প্রকৃতি জুড়ে। মানব প্রাণের মতো প্রকৃতি পারেনা গৃহবন্দী হতে, “করোনা ভাইরাসের” আতঙ্কে। প্রকৃতি আর মানবপ্রাণ সহ ধরিত্রীকে রেখেছে এখনো বাঁচিয়ে সৃষ্টিকর্তা। বেলা গড়িয়ে যায় আপন গতিতে।

Purbi Naskar

Sudipto

Rajia Mondal

বিষম অসুখ

সৌমেন বৈদ্য
পঞ্চম সেমিস্টার
বি.এ. জেনারেল
ভূগোল বিভাগ

পৃথিবী জুড়ে ছড়াচ্ছে করোনা অসুখ
মানুষের মনে তাই নেই কোনো সুখ।
মৃত্যু শুধু মৃত্যু সবার দ্বারে দ্বারে
মাস্ক পর সবাই থাকো নিজের ঘরে ঘরে।
মোদের রাখতে হবে মনের বল,
কখনো আমরা যেন না হই দুর্বল।
ডাক্তার-নার্স-সাফাই কর্মী, আজ বড় প্রিয়
ওদের আপন ভেবে হতে হবে সক্রিয়।
জাত-পাত, ধনী-গরীব, মানে না এ অসুখ
মনের জোরে সবাই মিলে, আনতে হবে সুখ।
সর্বক্ষন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকো সবাই
তবেই এ রোগের সঙ্গে করবে তীব্র লড়াই।
করোনার ভয়ে ভীত হোয়ো নাকো ভাই।
রক্ষা করবে মোদের গোবিন্দ গোঁসাই।
সবাই মিলে ডাকো পয়াময়কে ভাই
মনের গভীরে সবাই দিও তাঁরে ঠাঁই।

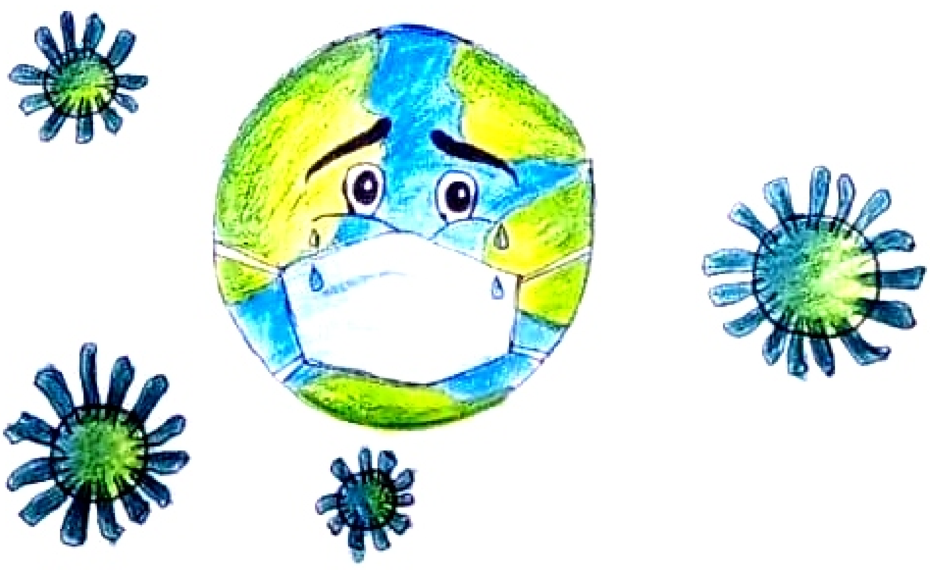

"যে জলকে অবহেলায় করছো আজ অপচয় ও বিষাক্ত....."

পারুল দাস
শিক্ষিকা, ভূগোল বিভাগ
ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ

"ছোট্ট রিনি করছে আবদার-/ মাগো খেলনা চাইনা, কলটা বন্ধ করো এবার;
দিদিমনিরা শিখিয়েছে ইস্কুলেতে হাতে নিয়ে অনেকটা সময় / করলে জলের অপচয়, সমস্ত প্রাণের হবে ক্ষয়!
তাইতো বলছি মাগো, করোনা আর জল নষ্ট, / আসছে জল সংকট, জল ফুরালে হবে যে বড়ই কষ্ট !!"

সভ্যতার উন্নয়ন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে ...... শহর, নগর, উঁচু উঁচু ইমারত, চওড়া রাস্তা, গ্রাম্য জীবনযাত্রা থেকে উন্নত জীবনযাত্রার দিকে এগোতে গিয়ে অরণ্য ছেদন, জলাভূমিম বুজিয়ে সাফ করে অর্থনীতির উদারতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে সমাজ সংসার ও জীবজগতে ছড়িয়ে যাচ্ছে সুদূরপ্রসারী বিপন্নতার অসুখ। মানুষ তো বটেই, বিপন্ন হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। এই রকমই একটি বিপন্নতা হল 'ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের হ্রাস'— যা সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য 'জল সংকট' নামক বিপদকে ডেকে এনেছে। এই জল সংকট - পানীয় জলের অভাবজনিত ও দুষণজনিত সমস্যা রূপে ক্রমাগত ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে।

একটা সময়ে পৃথিবীর কোন দেশেই মাটির তলা থেকে তোলা ভূ-গর্ভস্থ জল, পানীয় জল হিসাবে পানের প্রচলন ছিল না। নদী এবং পুকুরের জল পান করাই ছিল প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সেনা ক্যাম্পে টিউবওয়েল বসিয়ে জল পানের পদ্ধতি চালু হয়, কারণ সেনা দল নদীতে জল পান করতে গেলে শত্রুপক্ষের হামলার শিকার হতে পারে, তাই ক্যাম্পেই তৈরি হলো পানীয় জলের উৎস। ধীরে ধীরে মাটির তলার জলের অপব্যবহারের সূত্রপাত তারপর থেকেই শুরু হলো যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে এখন গোটা পৃথিবীর মানুষকেই। আজ গ্রাম অথবা শহরের কোন মানুষই এই সংকটের বাইরে নেই ভারত তথা বাংলার কিছু বাস্তব ভয়াবহ রূপ এখানে উল্লেখ করা হল —

কলকাতা শহরে যে বড় বড় নগর উপনগরী তৈরি হচ্ছে সেই নির্মাণ কার্যে প্রোমোটাররা মাটির তলার জল ব্যবহার করছেন। এইভাবে ভূ-গর্ভস্থ জল তুলে ফেলার ফলে বহু স্তানে জলস্তর নেমে গিয়েছে, কলকাতার মধ্যাঞ্চল - বিবাদীবাগ, এক্সপ্ল্যানেড, পার্কস্ট্রিট, লোয়ার সার্কুলার রোড, পার্কসার্কাস প্রভৃতি অঞ্চলে জলস্তর নেমে গিয়েছে অনেকটাই নিচে। দক্ষিণ অঞ্চলে গড়িয়াহাট, রাসবিহারী, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, টালিগঞ্জ ও বেহালা অঞ্চলে যে সুস্বাদু ও সুন্দর ভূ-গর্ভস্থ জল ছিল তা আজ আর নেই; ওই একই জলস্তরে কোথাও মিষ্টি আবার কোথাও লবণাক্ত জল পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত বড় বড় জলাশয় এবং নদর্মাগুলি বন্ধ করে গড়ে উঠেছে উপনগরী, শপিংমল, ফিল্ম সিটি। ফুটপাত না রেখে, গাছ না লাগিয়ে, উন্নয়ন চলছে; পাড়ায় পাড়ায় বস্তি উন্নয়নের নামে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার অলিগলি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে মাটির তলায় আর বৃষ্টির জল প্রবেশ করতে পারছে না, ড্রেন দিয়ে সোজা গঙ্গা বা নদীতে পড়ছে যা সমুদ্রের নোনা জলকে স্ফীত করছে এবং জলস্তরে লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অনেক জায়গাতেই বোরো ধান এবং উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষের জন্য মাটির তলা থেকে প্রচুর জল পাম্প দিয়ে তুলে চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্ধমান ও দুর্গাপুর অঞ্চলে জলস্তর নেমে যাওয়ায় বড় বড় বাড়ি দেওয়ালে ও ছাদে ফাটল দেখা

মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অনেক জায়গাতেই বোরো ধান এবং উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষের জন্য মাটির তলা থেকে প্রচুর জল পাম্প দিয়ে তুলে চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্ধমান ও দুর্গাপুর অঞ্চলে জলস্তর নেমে যাওয়ায় বড় বড় বাড়ি দেওয়ালে ও ছাদে ফাটল দেখা যাচ্ছে। এছাড়া পানীয় জল এখন পণ্য, পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার কিছু মানুষজন মাটির তলা থেকে জল তুলে বিক্রি করতেও ব্যস্ত। তারা বড় বড় প্লাস্টিকের ডাব্বা করে বাড়িতে জলের যোগান দিয়ে আসছে মাসিক টাকার বিনিময়ে; ওই জল পানের উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে বা যাচাই করে দেখার মত সময় মানুষের নেই। বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে বিক্রীত জনপ্রিয় সুগন্ধযুক্ত পানীয় হিসেবে - কোলা, পেপসি, চেরী, লেমন-লাইম, রুট বিয়ার, অরেঞ্জ, গ্রেপ, ভ্যানিলা, জিঞ্জার এল ফ্রুট পাঞ্চ এর মতো ঠাণ্ডা পানীয়র কোম্পানিগুলির দায়ভার এক্ষেত্রে কম কিছু নয়। এছাড়া প্রতিটি পরিবারের জলের কলসি, গ্লাস, ঘটি- এগুলির জায়গা দখল করে নিয়েছে বোতলবন্দি পানীয় জল। ১৯৯১ সালে বোতলের পানীয়র চাহিদা ছিল কুড়ি লক্ষ পেটি। ২০০৪-০৫ সলে তার বার্ষিক চাহিদা দাঁড়ায় ১৫০০ লক্ষ পেটি। ভারতে সরকারি নির্দেশ নামা মেনে এই ধরনের পানীয় বোতল কারখানার পরিমাণ বর্তমানে ১০০০০- এর উপরে প্রতিদিন গড়ে এই বোতল কারখানাগুলি দু-তিন লক্ষ এর বেশি বোতল তৈরি করে তাকে। যার উৎস হিসাবে ভূ-গর্ভস্থ জলকেই তারা ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে সারা ভারতবর্ষে ভূ-গর্ভস্থ জল তুলে বোতলবন্দি করার কারখানাগুলির সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি হচ্ছে। কেরালায় কোকাকোলা কোম্পানির সাথে কৃষক সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের কথা আমাদের জানা এক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হল আর্সেনিক দূষণ। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ার ফলে ভূ-গর্ভের আর্সেনিক ঘটিত খনিজগুলি অক্সিজেনের সংযোগ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে, জলে দ্রবীভূত হয়ে জারিত হয়ে আর্সেনিক দূষণ ঘটায় যার থেকে আর্সেনিকোসিস রোগ, ফ্লুরাইড থেকে দাঁত, নখ, হাড়ের ক্ষয় রোগ ফ্লুরোসিস হত্বেচ্ছ তার সঙ্গে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে ক্যান্সারের মতো মারন রোগেও।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়ার প্রয়োজন —

- যেখানে সেখানে গভীর নলকূপ বসানো নিয়ম করে বন্ধ করা উচিত।
- শুধুমাত্র খরাপ্রবণ এলাকার জন্য পানীয় জলের ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে সেচের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন, সেই সঙ্গে জল শোধনাগার তৈরি করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- নদীর জল পরিশোধন করে পানের যোগ্য করে তোলা।
- অন্তত তিন মাস অন্তর পানীয় জলের পরীক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বজায় রাখতে হবে।
- সমস্ত ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণগত এবং গুণগত মান বজায় রাখার জন্য কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- জল অপচয় বন্ধ করা। ব্যবহার করার পর টিউবওয়েল বন্ধ করার প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

একটু চেষ্টা করলেই এই সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব, যার একটি নিদর্শন আমরা দেখতে পাই বর্তমানে মুম্বাই পৌরসভা কর্পোরেশন বৃষ্টির জলকে পরিশোধন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পানীয় জল হিসাবে জলকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। বৃষ্টির জল ধরে তাকে বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ এবং নতুন প্রজন্মের সাহায্য এক্ষেত্রে খুবই দরকার। সবশেষে বলা যায়, শুধু আইন করলেই হবে না, সমাজের সবস্তরের মানুষদের কাছেই জল সম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরা দরকার। সরকার, পৌরসভা, পঞ্চায়েত কর্মকর্তারা এই ব্যাপারে এখনও যদি সজাগ না হন তাহলে বলিভিয়ার মত এই দেশেও জলযুদ্ধ বেঁধে যাওয়া কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা হবে না।

তথ্য ঋণ ঃ (১) "যখন পৃথিবী বিপন্ন (সংকলন ঃ পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ)"; বিজ্ঞান অন্বেষক
(২) কবিতা "জল সংকট" — তমা কর্মকার।

প্রকৃতি পরিবেশ ও স্থিতিশীল উন্নয়ন
“গড়িয়ে চলুক মাড়িয়ে নয়”

মানসী ভুঞ্যা মাল
শিক্ষিকা, ভূগোল বিভাগ

প্রকৃতি ঃ পৃথিবী তার আপন খেয়ালে সৃষ্টি করেছে আকাশ, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মৃত্তিকা-বালুকার রাশি। শীতের হিমেল পরশ-গ্রীষ্মের দাবদাহ-বর্ষার বারি ধারা ও বাহারী ফুলে সাজানো ঋতুরঙ্গ। সবুজ বনানীর ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়, ফাঁকে-ফাঁকে, পাখি প্রজাতিদের হাঁকডাক পাশ কাটিয়ে উড়ে চলে যাওয়া। কীটপতঙ্গের আনাচে-কানাচে আনাগোনা এ সবকিছুতে যেন তার অবোধ শিশুদের কোল জুড়ে খেলাধুলা, বেশ খুশি হয়, মজা পায় সে।

পরিবেশ ঃ মানব জাতি পৃথিবীতে জন্মানোর পর থেকে সে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রকৃতির কোল খুঁজেছিল। ক্রমশ সে যত উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে ততই সে আপন পরিবেশ সাজিয়ে চলেছে নিজের মতো কোরে। পর্ণকুটির ছেড়ে প্রাসাদ বানিয়েছে আজ। আর তার চারিপাশ সাজিয়েছে আপনার ক্রোড়ে। প্রকৃতিকে দূরে ফেলে পরিপন্থী পরিবেশ বানিয়েছে সে।

উন্নয়ন ঃ উন্নয়নের চাকা যতই গড়িয়ে চলেছে সামনে ততই সে মাড়িয়ে চলেছে প্রকৃতি মায়ের কোল। পিছন ফিরে দেখলে শুধু দেখা যায় ছেদন-ভাঙ্গন-নির্বিচার-প্রকৃতির ধ্বংসলীলা। যা আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি যা প্রকৃতির অকৃপণ দান যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য প্রকৃতি সৃষ্ট তা বিনষ্ট করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। তা করতে গেলে ভারসাম্য নষ্ট হবে পরিবেশের। বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হবে আমাদের জীবন।

স্থিতিশীল উন্নয়ন ঃ তাই সৃষ্টি-স্বাচ্ছন্দ-উন্নতি-প্রগতির চাকা এগিয়ে চলুক উন্নয়নের সন্ধানে, প্রকৃতি বাঁচিয়ে সুস্থ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে স্থিতিশীলতার হাত ধরে।

পরিবেশ ও ভূগোল ঃ ব্যবহারিক দিক

ব্রততী দে

শিক্ষিকা, ভূগোল বিভাগ

ব্যবহারের ভূগোল না ভূগোলের ব্যবহার এই নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকবে। আলোচনা যত দীর্ঘ হয় জানার প্রক্রিয়া বাড়তে থাকে। এই আলোচনায় যদি 'পরিবেশ' শব্দটি এলে যুক্ত হয় তখন তার আর একটু শ্রীবৃদ্ধি হয়। 'পরিবেশ' শব্দটির সাথে অনেক শব্দ বন্ধ এসে যুক্ত হয়। যেমন - পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশের স্থিতাবস্থা ইত্যাদি। ভূগোলের আধারে এই বিষয় এসে গেলেই আমরা তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠি। গ্লোবাল ওর্য়ামিং, কার্বন এমিশন, দূষণ তার অঞ্চল বিশেষে ব্যাপ্তি ক্ষতি-বৃদ্ধি-বাড়ন্ত অনেক কিছু বিষয়ই আমরা জানি। ইন্টারনেটের সাহচর্যে বোতাম টিপলে তথ্য সমৃদ্ধ পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয়। এটা লেখার তাই কোন তথ্য নয় কিছু প্রশ্ন থাকুক যা আমাদের প্রতিদিনের আলোচনায় উঠে আসুক।

ভূগোল বিষয়ের আধারে থেকে আমাদের মনে পরিবেশ-উন্নয়ন এবং সচেতনতা এই আলোচনা গুলো বারে বারে ফিরে আসে। এবার এখানে যদি ঢুকে পড়ে ব্যবহারিক দিক তা হলে কতগুলো প্রশ্ন তৈরী হয়।

প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমাদের কাছে আসবে, ব্যবহারিক ভূগোল কি? প্রতিদিন আমরা যেখানে থাকি - সময় কাটাই- কাজ করি তার সম্যক জ্ঞান এবং তার সম্বন্ধে যে বোধ সেটাই ব্যবহারিক ভূগোল। যেমন - আমি যেখানে থাকি সেই জায়গা অঞ্চল, তার দিক, সেখানকার আবহাওয়া জলবায়ু, মাটি, জল, সংস্কৃতি ইত্যাদি। এই একটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা যদি ভাবতে শুরু করি এর অনেক অনেক দিক খুঁজে পাওয়া যাবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যাক পরিবেশ কি? একইভাবে আমাদের চারপাশের বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয় যাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। উপরন্ত শক্তি যা এগুলিকে চালনা করে তার আধার কে পরিবেশ বলে। যেমন - জলজ পরিবেশ, উদ্ভিদ পরিবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইত্যাদি। এখানেও এই প্রশ্ন কে নিয়ে ভাবতে শুরু করলে অনেক দিক খুঁজে পাওয়া যাবে।

তাহলে ভূগোল এবং পরিবেশের এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। শুধু জল ভিত্তিতে জানার আগ্রহ হলে ভূগোলের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ে। এবার আসা যাক পরের প্রশ্নে। ভূগোল আর পরিবেশের সম্পর্ক যদি এত দৃঢ় হয় তাহলে পরিবেশ আর ভূগোলের ব্যবহারিক দিক কি? এই আলোচনায় আমরা ভূগোলের কিছু শব্দবন্ধ কে নাড়াচাড়া করবো। যেমন - Spatial Scale কোন স্থানের আলোচনায় আমরা যা দেখি তাকে স্থানিক স্কেল বা Spatial Scale বলি। যখন আলোচনার বিস্তার বড় হয় তাকে বলি Macro Scale, যখন মাঝারি হয়, তাকে বলি Meso Scale এবং যখন ছোট হয় তাকে বলি Micro Scale.

ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনায় ভূগোল এবং পরিবেশের সম্যক জ্ঞানের জন্য দরকার, অর্থাৎ ছোট অঞ্চলে যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভূগোল এবং পরিবেশের জন্য দরকার। আমরা জানি পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। বহু তথ্য নির্মিত এই ধারণা দিয়ে যখন আমরা আমাদের চারপাশকে প্রত্যক্ষ (Observe) করবো এবং প্রশ্ন তুলবো সেটাই হবে ভূগোল-পরিবেশের ব্যবহারিক দিক। যেমন - আমরা

জানি প্লাস্টিক এর ব্যবহার পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। Micro Scale এ অর্থাৎ যখন আমরা নিজেদের প্রতিদিনের চারপাশকে দেখবো তখন অনেক ভাবনার পথ খুলে যাবে। নিজেরা প্লাস্টিকের বোতল বা গ্লাসে জল বা গরম পানীয় খাই কিনা। বাড়িতে এবং বাইরে প্লাস্টিক এবং থার্মোকলের থালায় খাই কিনা। গরমের সংস্পর্শে এইগুলো তৈরী হয় যা ক্যান্সারের জন্য দায়ী। এবার ঘর এবং বাইরে যেখানে প্রতিদিনের আমাদের চলন সেখানে এই উপাদান ব্যবহারের সাথে যত্র তত্র আমরা ফেলছি কিনা। সুতরাং ব্যবহারিক দিকের প্রথম জায়গা হল দেখা (Observe), তার থেকে প্রশ্ন তৈরী করা - নিজেরা পরিবেশ এবং ভুগোলের মধ্যে থেকে এই ব্যবহারিক প্রয়োগগুলো করছি কিনা? যত প্রত্যক্ষ করা বাড়বে তত প্রশ্ন বাড়বে। যত প্রশ্ন বাড়বে তখন তার সমাধানের পথও বেড়িয়ে আসবে। এভাবেই নিজস্ব ভুগোলের পরিধিতে পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন তুললে অনেক জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান হয়ে যাবে। আমরা এভাবেই - শব্দ দূষণ, জল দূষণ, বায়ু দূষণ, স্বাস্থ্য-সংক্রমণ, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের ব্যহারিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ভূমিকা দিয়ে ভূগোল এবং পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে পারি।